গর্ভবতী মায়ের যত্ন ...৪
এইডস সম্মেলন ...৪
কৃত্রিম পদ্ধতিতে শ্বাস প্রশ্বাস ...৬
নূতন ধরনের ডায়রিয়া ...৮

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ২ সংখ্যা ১ বৈশাখ ১৪০০

বাংলাদেশের মা ও শিশুদের পুষ্টিঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ডঃ এস.কে. রায় ও ডাঃ গোলাম মুস্তফা

বাংলাদেশে পরিচালিত ও প্রকাশিত কয়েকটি জরীপ ও গবেষণা থেকে দেখা যায় যে মা'দের স্বাস্থ্য ও শিশুদের পুষ্টির মান ক্রমবর্ধমান বহুমুখী সমস্যার কারণে উদ্বেগজনকভাবে নিম্নমুখী হচ্ছে। এই অবস্থা কেন হচ্ছে তা মূল্যায়ণ করা দরকার। এ ছাড়া মা'দের স্বাস্থ্য ও শিশুদের পুষ্টির মান উন্নয়নের জন্য বর্তমানে দেশে সরকারী, বেসরকারী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহীত পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার বিভিন্ন দিকগুলো আমাদের জানা দরকার। এ কথা আস্থার সাথে বলা যায় যে প্রত্যেকটি বিষয়ের যেমন সমস্যা রয়েছে তেমনি তার সমাধানও রয়েছে।

শারিরীক পুষ্টি সাধারণতঃ দু'টি প্রধান নিয়ামকের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ সুস্থ থাকার মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ সঠিক খাদ্য গ্রহণ এবং নানা প্রকার রোগব্যাধির আক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করতে হবে। এ দু'টির মধ্যে একটি অথবা খাদ্যাভাব ও সংক্রামক ব্যাধি এ দু'টি একত্রে হলে একজন মানুষের শরীরকে সহজেই খারাপ করতে পারে ও মানুষ অপুষ্টির শিকার হতে পারে। খাদ্যাভাব ও সংক্রামক ব্যাধির কারণে শিশু ও মায়েরা অতি সহজেই দূর্বল হয়ে পড়ে। এমনিতেই আমাদের দেশে পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবহেলিত। অন্যদিকে পারিবারিক খাবার বন্টনে বাংগালী মাতৃজাতির আবার চিরন্তন মূল্যবোধ এবং ত্যাগী মনোভাব অনেক গভীরে অবস্থিত। প্রায়ই দেখা যায়, খাবার সময় মা বা মহিলারা খাবারের সবচেয়ে ভাল অংশটুকু স্বামী অথবা উপার্জনক্ষম পরিবারের প্রধান পুরুষ সদস্যকে দেন এবং অবশিষ্ট যা থাকে তা মেয়ে বা গৃহিনীর ভাগ্যে জোটে। এক্ষেত্রে শাশুড়ী বা ননদের অগ্রাধিকার মায়েরও পূর্বে। মধ্যবিত্ত ও গরীব পরিবারে পর্যাপ্ত খাবার না থাকলে মায়ের জন্য একান্ত প্রয়োজন হলেও তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অন্যদের ইচ্ছানুযায়ী অর্থাৎ স্বামী বা শাশুড়ীর মতামতের দিকে লক্ষ্য রেখে। এর কারণ হচ্ছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মায়ের সরাসরি অবদান সাধারণতঃ থাকে'না। এদিকে পরিবারের সবার খাওয়া-দাওয়া, সন্তানের আদর-যত্ন, বাড়ীঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, সকলের নানা আব্দার ও দাবী-দাওয়া মাকেই দেখতে হয়। অথচ তাঁর নিজের প্রয়োজন, শারীরিক পরিশ্রম ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য ও বিশ্রামের কথা ভাবার লোক পরিবারে প্রায়ই কেউ থাকে না। এর উপর নিজের স্বামী ও সন্তানের যখন পেট ভরে না, তখন মা কি করে নিজের প্রয়োজন মেটাবেন। আমাদের সমাজে এটি মায়ের ত্যাগী মনোবৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ ও এটি একটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

হয়তো এ কারণেই মায়ের নিজের স্বাস্থ্যের বিনিময়ে তাঁর শিশুটি মারাত্মক অপুষ্টি ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় এবং বাড়ন্ত বয়সে খেলাধূলার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়ে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে সুষম খাবার, যা সংগ্রহ করা অধিকাংশ পরিবারের পক্ষেই হয়তো দুসাধ্য। এর পিছনে রয়েছে আর্থিক সংগতির প্রশ্ন যা প্রায় গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারেরই আয়ত্বের বাইরে থাকে।

রোগ-ব্যাধির কারণে শিশুদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়লে আমাদের দেশের মায়েরা অতি সহজেই তা বুঝতে পারেন এবং ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন। তা'হলে প্রশ্ন জাগে কেন মা তাঁর শিশুকে রোগমুক্ত করতে পারছেন না? আমাদের দেশের মায়েরা এখনো

(২য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

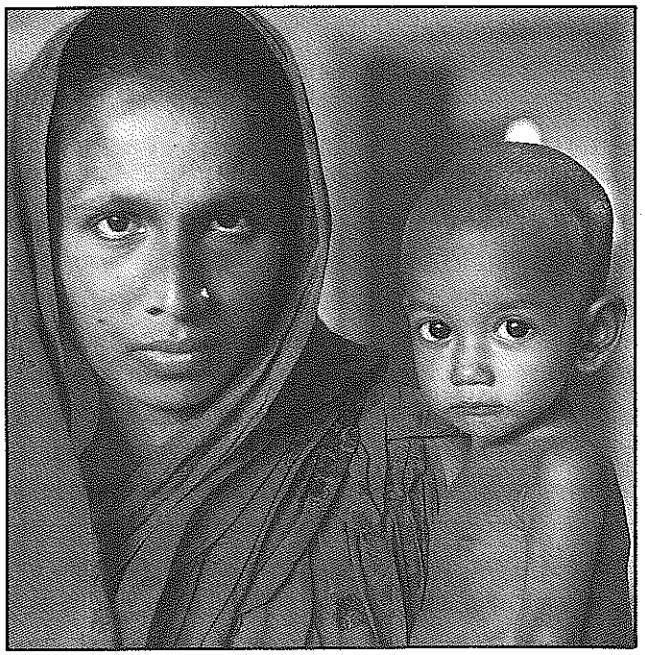

মায়ের স্বাস্থ্য ও শিশুর পুষ্টির মান উদ্বেগজনকভাবে নিম্নমুখী হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এই দেশে শিক্ষার হার এখনও পশ্চাদমুখী। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। আর এই নারী সমাজের শিক্ষার চিত্রটি রীতিমত উদ্বেগজনক। সর্বসাকুল্যে মাত্র শতকরা ২ ভাগের কিছু বেশী নারী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। শিক্ষা মানুষের জীবন মান, সমাজ ও পরিবার গঠনে সহায়ক। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শিক্ষিত পিতা-মাতা তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে অত্যন্ত সর্তক থাকেন। পক্ষান্তরে অধিকাংশ অশিক্ষিত পরিবারে ঠিক এর উল্টোটি দেখা যায়। বাংলাদেশে প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে ডায়রিয়াজনিত রোগ, সংক্রামক ব্যাধি ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা। এসব স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু মারা যাচ্ছে। অথচ শুধু মাত্র স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকলেই এসব রোগ হতে শিশুদের রক্ষা করা যায়। পাশাপাশি আর একটি সমস্যা দেখা যায় তা হচ্ছে টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার রোগে মা'দের অকাল মৃত্যু। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬ জন এবং শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১১০ জন। লক্ষণীয় ডায়রিয়াজনিত রোগ যেমনঃ কলেরা, ডায়রিয়া ও আমাশয়, সংক্রামক রোগ যেমনঃ ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হাম, পোলিও ও যক্ষা, অপুষ্টিজনিত রোগ যেমনঃ হাড্ডি সার, গা ফোলা, রাতকানা, অন্ধত্ব ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব রোগ বিস্তার কিছুটা হ্রাস পেলেও সম্পূর্ণ প্রতিরোধ এখনও অনেক বাকী। ইপিআই দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী দেশের টিকাদান কর্মসূচীতে অর্জিত সাফল্য শতকরা ৬৫ ভাগ অর্থাৎ শতকরা ৬৫ ভাগ মা ও শিশু সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় এসেছে। ডায়রিয়ায় প্রতিবছর বাংলাদেশে আক্রান্ত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ লোক এবং অজ্ঞতার কারণে অনেকের মৃত্যুও ঘটছে। অপুষ্টিজনিত রোগের মধ্যে অন্ধত্ব সব চাইতে বড় সমস্যা। শুধুমাত্র ভিটামিন এ-এর অভাবে প্রতি বছর ৩০ হাজার শিশুকে অন্ধত্ব বরণ করতে হচ্ছে। অথচ উপরের আলোচিত সব রোগই প্রতিরোধ করা সম্ভব। আর এই প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্য সচেতনতা ও মা'দের শিক্ষা। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মা'দের অতি দ্রুত শিক্ষিত করে তোলা বা নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা কঠিন। অথচ বিকল্প হিসেবে সংকট উত্তরণে মা'দের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা একান্ত দরকার। আর এই কাজটি সফলভাবে করতে পারেন সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কর্মরত মাঠকর্মীগণ। মাঠকর্মীরাই গ্রাম পর্যায়ে মা'দের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে উপদেশ ও সহযোগিতা করে থাকেন, তাই বিভিন্ন মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধিমুক্ত পরিবার গঠনে মা'দের সচেতন করে তোলার প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ডায়রিয়া প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের বুঝাতে হবে যে বাসি-পঁচা খাবার কিংবা খোলা জায়গায় রাখা খাবার খাবেন না। নলকূপের পানি পান করবেন, নিকটে নলকূপ না থাকলে পানি ফুটিয়ে পান করবেন, মলত্যাগের পর ভাল করে সাবান অথবা ছাই দিয়ে হাত পরিষ্কার করবেন, স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃ ব্যবহার করবেন ইত্যাদি। একইভাবে ধনুষ্টংকার রোগ প্রতিরোধে মা'দের গর্ভকালীন চার হতে সাত মাসের মধ্যে এক মাস অন্তর অন্তর দু'টি টিটি (ধনুষ্টংকার) টিকা দিতে হবে, শিশুকে দেড়মাস বয়স হতে এক বছরের মধ্যে ছয়টি টিকাদান সম্পন্ন করতে হবে। শিশুদেরকে বুকের দুধ খাওয়ানোর পাশাপাশি ৪ মাস বয়স হতে নরম খাবার, তেল দিয়ে রান্না করে নরম খিচুড়ী ও একটু একটু করে শাক-সব্জি খাওয়াতে হবে এবং পরিবার ছোট ও পরিকল্পিত রাখার জন্য মা'দের বুঝাতে হবে। আর প্রাথমিকভাবে এসব কাজ করার দায়িত্ব মাঠকর্মীর। সুতরাং মাঠকর্মীকে বলা যেতে পারে প্রধান সহায়ক শক্তি। আর এই প্রধান সহায়ক শক্তিকে যথার্থরূপে কাজে লাগানোর দায়িত্ব সরকার ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের। জনস্বার্থে বিষয়টির অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। ■

মা ও শিশুদের পুষ্টি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাম, যক্ষা, ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, পোলিও বা হুপিং কাশির জন্য প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে টিকা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব কম বোঝেন। আবার দিতে চাইলেও কোথায় তা দেয়া যায় তা জানেন না। কিংবা নানা কারণে টিকা দেয়া আরম্ভ করে আবার সবগুলোর ডোজ শেষ করা হয় না। এ সত্ত্বেও বাংলাদেশে সকল প্রকার স্বাস্থ্য সেবার মধ্যে এ পর্যন্ত টিকাদান কর্মসূচী সব চেয়ে দ্রুত ও বেশী সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এর পর আসে পরিবারের জন্য বিনা মূল্যে বা অর্থের বিনিময়ে স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা। আমাদের দেশে এটা সাধারণতঃ পাওয়া দুস্কর। স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গ্রাম থেকে বেশ দূরে অবস্থিত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকায় সেখানে যাবার খরচ ও সময় লাগে অনেক। তারপর অনেক ক্ষেত্রে যেতে পারলেও দেখা যায় ডাক্তার নেই। আবার ডাক্তার ও রোগের জন্য ব্যবস্থাপত্র পাওয়া গেলেও ঔষধ নেই। ফলে, শেষ পর্যন্ত বিত্তবান পরিবার ছাড়া অন্য সকলেই নিরুৎসাহিত হন এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা সরকারী স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহের সুফল পান না। ফলে, হাতুড়ে ডাক্তার বা গ্রাম্য কবিরাজ যিনি সময়ে অসময়ে বন্ধুর মত উপস্থিত হতে পারেন তাঁর উপর এসব গরীব লোকদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নির্ভর করে। অন্যদিকে শিক্ষিত লোকদের জন্য সরকারী বা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা লাভের সুযোগ বেশী। তাই শিক্ষার অভাব এবং সহযোগী দারিদ্র সম্মিলিতভাবে শিশু ও মায়ের অসুস্থতার প্রতিকার লাভের ক্ষেত্রে অন্তরায়। এসব কারণে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উপকরণের অভাব, খাবার পানি এবং অন্যান্য দৈনন্দিন কাজে প্রয়োজনীয় পানির অভাব ও বারবার ডায়রিয়া, কাশি, জ্বর, হাম, আমাশয় ইত্যাদি রোগের সময়ে সঠিক চিকিৎসা ও উপযুক্ত খাবারের অভাবেই পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।

ঘরে খাবার থাকলে বাচ্চাকে দিতে চায় না এমন কোন মা নেই। আবার শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলে তার ক্ষুধা লাগবে না বা সে খেতে চায় না এমনটিও হবার নয়। তাহলে অপুষ্টি হয় কোথা থেকে? এর কারণ শুধু অজ্ঞতা নয়, বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থিক অসুবিধা ও উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহের অভাব। শিশুরা যখন পুষ্টিহীনতায় ভোগে তখন মায়েরা ৭৫ ভাগ ক্ষেত্রেই বুঝতে পারেন এবং শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা বলতে পারেন যে খাবারের অভাব ছিল বা চিকিৎসার সুযোগের অভাবই পুষ্টিহীনতার কারণ। তবে আর্থ-সামাজিক ও মৌলিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না হলে রোগ-ব্যাধি বারবার হতে থাকবে এবং চিকিৎসার প্রয়োজনও বাড়বে। নিরাময়ের চেয়ে প্রতিরোধ অনেক ভাল। তাই এটাও একটা জরুরী জনস্বাস্থ্য বিষয়। মায়ের স্বাস্থ্যহানির অনেকগুলো কারণের মধ্যে আমাদের দেশের সামাজিক কারণগুলো উল্লেখযোগ্য। আর এর মূলও অনেক গভীরে।

অল্প বয়সে মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে দেয়া উচিত বলে আমাদের দেশের অধিকাংশ বাবা-মা মনে করেন। এ বিষয়ে পাশের বাড়ীর মুরুব্বী, প্রতিবেশী, দাদী ও নানীদের উপদেশ বা আদেশও প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

নানা কারণেই আমাদের দেশের গরীব পরিবারের মা-বাবা বা গুরুজনরা মেয়েদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দারিদ্রতার কারণে মেয়েদের লেখা-পড়া করানোর জন্য প্রয়োজনীয় পয়সার অভাব, শিক্ষিত মেয়েদের শিক্ষিত পাত্রের কাছে বিয়ে দিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, পণ প্রথা ইত্যাদি কারণে মেয়েদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অল্প বয়সে বিয়ে বা কম বয়সে সন্তানের মা হলে মায়ের স্বাস্থ্য ভেংগে যায় বা বাচ্চার জন্ম-ওজন কম হয়। প্রধানতঃ শতকরা ৪০ ভাগ বাচ্চা কম ওজনে (২.৫ কেজীর নিচে) জন্মায় বলে পরবর্তীতে অসুস্থতা ও নবজাতকের বা শিশু-মৃত্যুর হারও বেশী।

এদিকে সামাজিক কারণে অন্ততঃ ১৮ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর মেয়েদের বিবাহ দেয়ার আইন থাকলেও অনেকক্ষেত্রে তা বলবৎ হয় না। উপযুক্ত জন্ম-নিরোধ পদ্ধতি হাতের কাছে না থাকায়, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করায় এবং জন্ম-নিরোধ পদ্ধতির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলে তাৎক্ষণিক প্রতিকারের ব্যবস্থা না থাকার কারণে মায়ের ঘন ঘন গর্ভবতী হবার সমস্যাগুলো ও সেই সঙ্গে শিশু-মৃত্যুর উচ্চ হার বাড়তে থাকে। সে জন্য মাতৃমংগল কেন্দ্র ও সেবা একটি অতি জরুরী বিষয়। মায়ের সাধারণ অসুস্থতার চিকিৎসা ও প্রতিরোধের পাশাপাশি প্রসূতি ও গর্ভাবস্থা নিরোধ ও চিকিৎসা প্রয়োজন। আজকাল আলোচনা হচ্ছে, প্রসূতির শিশু জন্মের পর পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা করে দেয়া এবং এর জন্য শুধু হাসপাতাল বা ডাক্তারের উপর নির্ভর করলে চলবে না। গ্রামভিত্তিক প্রসূতি ও মাতৃসদন কর্মীদের সেবা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

এ দেশে প্রসূতির খাবারের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয় না। আবার আমাদের অনেকের মধ্যে নানা ধরনের কুসংস্কার আছে, যেমন বেশী খেলে বাচ্চা বাড়বে, ফলে প্রসবের সময় খুবই অসুবিধা হবে ইত্যাদি। হিন্দুদের মধ্যে আবার মাছ-মাংস খাওয়ার উপরে বিশেষ বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করা হয় বলে খাদ্যে আমিষের ঘাটতিও দেখা দেয়। এ সকল কারণে গর্ভকালীন সময়ে যখন একটি শিশুর দেহ গঠনের জন্য অতিরিক্ত খাবার প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের জন্য মাতৃ দেহের ওজন বৃদ্ধির দরকার তখন আমাদের দেশে ঠিক এর উল্টোটি দেখা যায়। এর ফলে গর্ভবতী মায়েরা অপুষ্টিতে ভোগেন এবং গর্ভস্থ শিশুর ওজনও কম হয়। এ অবস্থার উন্নতি করতে হলে গর্ভবর্তী মা'দের খাবারের দিকে পরিবারের সকলের, বিশেষ করে স্বামী ও শাশুড়ীর বিশেষ নজর দিতে হবে ও সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে হবে।

আর ক্যালরী বৃদ্ধির সহজ উপায় হল রান্নার সময় যথেষ্ট পরিমাণে তেল ব্যবহার করা। গর্ভাবস্থায় পাকস্থলীর প্রসারণ সীমিত থাকায় ভাত, তরকারী ইত্যাদির পরিমাণ খুব বাড়ানো যায় না, কিন্তু বারবার অল্প করে খাওয়া এবং তেল বা স্নেহ জাতীয় অথবা দুধ-পায়েসের মত তরল জাতীয় খাবার খাওয়া সম্ভব। প্রতিদিন একটু কলিজা, ছোট মাছ, ডাল, সবুজ শাক, কুমড়া, কলা বাড়তি তেল দিয়ে প্রায় ৪ টাকার মধ্যে অন্ততঃ ৪০০ কিলো ক্যালরী খাদ্য-শক্তি পাওয়া যায়। বিশেষ করে গর্ভকালীন সময়ের শেষ তিন মাসে এই খাদ্যের প্রয়োজন খুব বেশী এবং হৃষ্টপুষ্ট শিশু ও স্বাস্থ্যবতী মায়ের জন্য এই বাড়তি খরচটিও খুব বেশী নয়।

সাধারণ মানুষ সুষম খাদ্য ও খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে অজ্ঞ। কয়েক রকম খাবার মিশিয়ে খাবার সুষম করা যায়। যেমন ১) চাল-আটা, ২) তেল, ৩) ডাল, সীম, মাছ, ডিম বা দুধ ও মাংস ও ৪) শাক মিশিয়ে ১ বার অতিরিক্ত খাবার খেলে প্রসূতি মায়ের চাহিদানুযায়ী বাড়তি খাবার হয়ে যায়।

বিভিন্ন দেশে পরিচালিত গবেষণা হতে দেখা গিয়েছে যে এই বাড়তি খাবারের ফলে নবজাতকের ওজন বাড়ে, মায়ের বুকে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও সন্তান সুস্বাস্থ্যের সাথে বেড়ে উঠে। শিশু স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কখনই মায়ের চেয়ে কম বা বেশী নয়। দেখা গিয়েছে যে মা অসুস্থ হলে তার কদিন পরেই তাঁর সন্তান অবহেলা বা যত্নের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই মায়ের স্বাস্থ্য শিশু স্বাস্থ্যের সহিত সরাসরি জড়িত। শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জন্মের পরপরই শাল দুধ দিতে হবে। তাছাড়া দেড় মাস বয়স হতে শুরু করে প্রতি ১ মাস অন্তর অন্তর টিকার তিনটি ডোজ দিতে হবে। এরপর ৬ মাস বয়স হতে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিবারের সব রকম খাবার দিতে হবে এবং ২ বৎসর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। এছাড়া ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া বা অন্য কোন অসুখ হলেই উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এটাই সাধারণতঃ বস্তি অঞ্চলে বা গরীব পরিবারের বেলায় হয়ে ওঠে না।

মহল্লা বা গ্রাম বা ইউনিয়নের জন্য এলাকা-ভিত্তিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা পরামর্শ, টিকাদান, প্রসূতি পরামর্শ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এসব জায়গায় স্থানীয় কর্মী নিয়োগ, পরিসংখ্যান রাখা এবং স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও তদারকী প্রয়োজন। স্থানীয়-ভিত্তিক সক্ষম কর্মসূচী ছাড়া মাতৃ স্বাস্থ্য বা শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতির বিকল্প কোন সহজ উপায় নেই।

১৯৮২ সালে বাংলাদেশে এক পুষ্টি জরীপে দেখা যায় যে গরীব পরিবারের শিশুদের খাদ্য তালিকায় দুধের কোন স্থান ছিল না। শিশুরা তাদের দৈনন্দিন খাদ্য থেকে প্রয়োজনের মাত্র অর্ধেক শক্তি পায়; মা'দের ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা। গরীব পরিবারে শুধু খাদ্য ঘাটতি নয়, অপুষ্টিতে ভুগছে এমন শিশুর সংখ্যা খুব বেশী। ১০ বছর পরেও আজ ঐ অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। শুধু আপদকালীন ত্রাণ সাহায্য দিয়ে এই ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় এবং এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের সরকার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বিশ্ব ব্যাংক, ইউনিসেফ, পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, পুষ্টি পরিষদ, জাতিসংঘ, খাদ্য ও কৃষি বিভাগ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বড় বড় স্বেচ্ছাসেবী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সমবেত চেষ্টায় বর্তমানে দেশে দীর্ঘ মেয়াদী মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রকল্প তৈরী ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। এই পরিকল্পনা স্থানীয় ও গ্রাম-ভিত্তিক হবে। আশা করা যায়, এই ব্যাপক কার্যক্রমের মধ্যে দারিদ্র-পীড়িত সমস্যা ও অপুষ্টিরোধে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী থাকবে। উল্লেখ্য, ভারতের তামিলনাড়ু ও অন্যান্য দেশে শিশু পুষ্টি বিষয়ে স্থানীয় কর্মসূচী ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে।

আশার কথা, বর্তমানে মাতৃ ও শিশু মংগলের দিকটি উল্লেখযোগ্যভাবে আলোচিত হচ্ছে, তবে এই সকল স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উদ্যোগে সকল স্তরের জনগণের ব্যাপক ও সক্রিয় অংশগ্রহণই কেবল সাফল্যকে বাস্তব রূপ দিতে পারে। ■

আমষ্টার্ডামে আন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলন

২০০০ সালের মধ্যে এইডস-এ আক্রান্তের অধিকাংশই হবে মহিলা

– সংলাপ রিপোর্ট –

মরণ ব্যাধি এইডস (AIDS : Acquired Immunodeficiency Syndrome) বিশ্বব্যাপী মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। HIV নামক এক ধরনের ভাইরাস দ্বারা এই রোগের সৃষ্টি হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ সারা বিশ্বে অন্ততঃ ৪০ মিলিয়ন লোক এইডস ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হবে। ২ হাজার সালের মধ্যে ১০ মিলিয়ন লোক এইডস রোগে আক্রান্ত হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে আক্রান্তদের বেশীর ভাগ থাকবে মহিলা। আর একটি ভয়াবহ ব্যাপার হল, মোট আক্রান্তদের শতকরা ৯০ ভাগ হবে উন্নয়নশীল দেশের। বিশ্বব্যাপী 'এইডস-এর ভয়াবহ বিস্তার হতে এশিয়া মুক্ত' - কয়েক বছর আগেও এই ধারণা পোষণ করা হতো। তাছাড়া কেবল আফ্রিকা ও পশ্চিমা দেশে এ রোগের অস্তিত্ব রয়েছে বলে মনে করা হতো। কিন্তু এই ধারণা টিকেনি। ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, আশির দশকের মধ্যভাগে এশিয়ায় এইডস আক্রান্ত হওয়ার খবর তেমন একটা পাওয়া যায়নি, কিন্তু বর্তমানে এশিয়ায় ১০ লক্ষেরও বেশী লোক এইডস-এ আক্রান্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বরাত দিয়ে পত্রিকাটি এই খবর দিয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, এইডস ভাইরাস বহনকারীদের অধিকাংশই থাইল্যান্ড ও ভারতের। তবে এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশে আক্রান্ত রোগীদের যে সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, প্রকৃত সংখ্যা তার চেয়েও অনেক বেশী হবে। বিদেশী পর্যটক আকর্ষণ, বিনিয়োগ ও শ্রমিক রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এশিয়ার কতিপয় দেশ এই সত্যটিকে গোপন রাখে। বিপুল জনসংখ্যা, দারিদ্রতা, রোগ সম্পর্কে অজ্ঞতা, যৌন শিল্পের বিকাশ, ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণ, ব্যাপকভাবে শ্রমিকদের দেশান্তর, ব্যবসায়ীক সফর এবং পর্যটনের দ্রুত বৃদ্ধি এশিয়াকে বিশ্বে এইডস বিস্তারের প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। এশিয়ার এই সংকটজনক সমস্যাটি সম্প্রতি আমষ্টার্ডামে অনুষ্ঠিত অষ্টম আন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এইডস কর্মসূচীর পরিচালক ডঃ মাইকেল মার্সন সম্মেলনে এশিয়ায় এইডস বিস্তারের ওপর আলোকপাত করে বলেন, চলতি দশকের মাঝামাঝি নাগাদ প্রতি বছর আফ্রিকানদের চেয়ে এশীয়দের আক্রান্তের হার বেশী হবে। তিনি বলেছেন, ২ হাজার সাল নাগাদ এইডস-এ আক্রান্তদের অধিকাংশই হবে মহিলা। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে ১৫ হাজার মহিলা এইডস-এ আক্রান্ত হচ্ছে।

সম্মেলনে ভারতের বোম্বাই শহরে দেহপসারিণীদের নিয়ে কর্মরত ডাঃ সত্যনারায়ণ গিন্ডা বলেন, এই নগরীর ১ লক্ষ দেহপসারিণীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশই এইডস ভাইরাস বহন করছে। এদের অতি অল্প সংখ্যকই যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরাপদ পদ্ধতি অবলম্বন করে। থাইল্যান্ডের শিশু ফাউন্ডেশনের কর্মী ফাইথুন মানচাই বলেন, যৌন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ৩০ হাজারেরও বেশী মেয়ে এইডস-এ আক্রান্ত। ফাউন্ডেশনের তথ্যানুযায়ী কমপক্ষে ৮ লক্ষ থাই মহিলা দেশের পতিতালয়, ম্যাসাজ পার্লার ও পানালয়ে কাজ করছে। এই সংখ্যার মধ্যে সৌখিন বারবণিতারাও রয়েছে।

এই অষ্টম এইডস সম্মেলনে অন্ততঃ ১০ হাজার বিজ্ঞানী, নীতি-নির্ধারক, কর্মী ও আক্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করেন। ■

গর্ভবতী মায়ের যত্ন

তানজিনা মির্জা

গর্ভধারণ করা প্রত্যেক মহিলার জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নবজাত শিশু বাড়ীর সবার জন্য বয়ে আনে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস। মায়ের গর্ভে শিশু আস্তে আস্তে বড় হয় এবং এই বাড়ন্ত শিশুর প্রয়োজন মেটাতে মা'র শরীরে দেখা দেয় নানা পরিবর্তন। গর্ভের শিশুর সমস্ত চাহিদা পূরণ হয় মা'র শরীর থেকেই। তাই মা'র কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক ঘাটতি থাকলে তার গর্ভের শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই কাঙ্ক্ষিত সন্তানের এবং মায়ের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ যত্নের। এই যত্নকেই বলা হয় গর্ভকালীন যত্ন বা Antenatal care।

গর্ভাবস্থার পরিণতি সব সময় আনন্দদায়ক হয় না। বিশেষ করে আমাদের দেশে অনেক মা গর্ভাবস্থায় বা প্রসবকালে অথবা পরবর্তী ৪০ দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। আবার অনেকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ধুকে ধুকে বাকী জীবন কাটান। ঠিক তেমনি অনেক শিশুও পৃথিবীর আলো দেখার আগেই মৃত্যুবরণ করে বা জন্মের এক মাসের মধ্যেই মারা যায়। যারা বেঁচে থাকে তাদের অনেকেই হয় রুগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী। মা'র স্বাস্থ্য খারাপ থাকলে তার নবজাত সন্তান হয় ছোট ও স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে কম। এসব সন্তান পরবর্তীতে সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে না। তবে প্রশ্ন হলো, কেন অধিক সংখ্যক শিশু অকালে মারা যাবে (দেশে পরিসংখ্যান অনুসারে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১১০ জন), কেন মহিলারা ধুকে ধুকে বাঁচবে, এসব জটিলতা দেখা দেয়ার কারণ কি?

এই সবকটি প্রশ্নের উত্তর হলো মা'র গর্ভকালীন সময়ে সুষ্ঠু ও প্রয়োজনীয় যত্নের অভাব। নিয়মিত, সঠিক এবং সময়োপযোগী যত্ন পেলে গর্ভবতী ও কাঙ্ক্ষিত শিশু সন্তান উভয়ের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব।

গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা

গর্ভকালীন সময় নিয়মিতভাবে ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নেয়া উচিত। এই পরামর্শ নেয়ার জন্য সাক্ষাতের সময়সূচী হলোঃ

* প্রথম ছয় মাসে - প্রতি মাসে ১ বার
* সপ্তম ও অষ্টম মাসে - প্রতি মাসে ২ বার
* নবম অর্থাৎ শেষ মাসে - প্রতি সপ্তাহে ১ বার

যদিও উল্লিখিত নিয়ম সর্বাপেক্ষা শ্রেয়, কিন্তু এই সময়সূচী গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মা'দের পক্ষে মেনে চলা সম্ভবপর নয়। মাঠকর্মী বোন (FWA) সময় অনুযায়ী তাঁর এলাকার সব গর্ভবতী মা'দের দেখতে যান। তবে শুধু পরিবার কল্যাণ সহকারীর (FWA) পরামর্শই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক গর্ভবতী মা'কে অবশ্যই পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার (FWV) সঙ্গে দেখা করতে হবে। নূন্যতম পক্ষে গর্ভকালীন সময়ে অন্ততঃ তিনবার পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার কাছে যেতে হবে।

বিপজ্জনক/ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা

গর্ভকালীন অবস্থা একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম। তবে এই অবস্থায় কিছু ঝুঁকি বা বিপদ থাকে। সব মা'দের বেলায় এটা সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। কারও ঝুঁকি বেশী, কারও কম। এই ঝুঁকিপূর্ণ মা'কে চিহ্নিত করা খুব কঠিন কিছু নয়। নিয়মিতভাবে গর্ভকালীন অবস্থায় পরীক্ষা করলে ঝুঁকিপূর্ণ মহিলাদের সনাক্ত করা

যায়। মাঠকর্মী বোনরাই ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা সনাক্ত করতে পারেন। কিন্তু শুধু সনাক্ত করলেই হবে না, যারা ঝুঁকিপূর্ণ তাদের অবশ্যই বিশেষ চিকিৎসা পেতে হবে। এসব গর্ভবতী মহিলাদের FWV অথবা ডাক্তারের কাছে সঠিক চিকিৎসা ও পরামর্শের জন্য যেতে হবে। বেশীর ভাগ ঝুঁকিপূর্ণ মাকে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষন করলে তাঁদের জটিলতা দূর করা যায়।

ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা বাছাইকরণ তালিকা

ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মা'দের সনাক্ত করার জন্য রয়েছে তালিকা। এই তালিকা সব FWA রেজিষ্ট্রারের শেষ পাতায় আছে। এটা প্রণয়ন করার উদ্দেশ্য হলো একটাই, যাতে মাঠকর্মী বোন স্বল্প সময়ে সহজেই বুঝতে পারেন কোন গর্ভবতী মহিলার ঝুঁকি বেশী। এই তালিকায় কিছু প্রশ্ন রয়েছে যা গর্ভবতী মাকে করা হয়। এ সকল প্রশ্নের যে কোন একটির উত্তর হ্যাঁ হলে সেই গর্ভবতী মহিলাকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয় এবং তাকে উপযুক্ত পরামর্শ দেয়া হয়।

কারা ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী

* মহিলার বয়স ১৮ বছরের নিচে বা ৩৫ বছরের উপরে।
* প্রথম সন্তান ধারণ।
* ৫ বা ততোধিক সন্তান হয়েছে।
* ছোট সন্তানের বয়স এক বৎসরের কম।
* পূর্ববর্তী গর্ভকালীন অবস্থায় রক্তক্ষরণ।
* খুব খাট মহিলা।
* গত প্রসবে অপারেশন/অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ/দীর্ঘস্থায়ী (প্রসবকাল ২৪ ঘন্টার বেশী) হলে।
* গত প্রসবে সন্তান ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মারা যাওয়া অথবা মৃত সন্তান প্রসব।
* বর্তমান গর্ভাবস্থায় যে কোন সময় রক্তক্ষরণ।
* হাতে পায়ে অতিরিক্ত পানি আসা।
* খুব মাথা ব্যথা হওয়া অথবা চোখে ঝাপসা দেখা।
* অতিরিক্ত রক্তশূন্যতা।
* প্রস্রাবের সময় জ্বালা যন্ত্রনা।

এই তালিকা ব্যবহার করে মাঠকর্মী বোন ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মা'দের সনাক্ত করে তাঁদের উন্নত চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করতে পারেন।

প্রেরণ (Referral)

প্রত্যেক মাঠকর্মী বোনের (FWA) একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে গর্ভবতী মা'দের FWV-এর নিকট প্রেরণ করা। যদিও সব গর্ভবতীদেরই FWV-এর সঙ্গে দেখা করা আবশ্যক তবে ঝুঁকিপূর্ণ মা'দের বেলায় এটা বেশী প্রয়োজন। তাছাড়া মায়েদের টিকা নেয়ার জন্য মাঠকর্মী বোনেরা টিকা দান কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। যেহেতু আমাদের দেশের মা-বোনেরা সহজে বাড়ী থেকে বেরুতে পারেন না, মাঠকর্মী বোনই পারেন তাঁদের বুঝিয়ে এই ব্যাপারে রাজী করাতে। কোন পুরাতন প্রথাই সহজে বদলানো যায় না। তাই FWA দের ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আস্তে আস্তে গর্ভবতী মা এবং আত্মীয় স্বজনকে বুঝাতে হবে, কেন তিনি বাড়ী থেকে বেরুবেন, কেন তাঁর FWA বা ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার।

গর্ভকালীন খাদ্য

গর্ভাবস্থায় সব ধরনের খাদ্যই গর্ভবতীর জন্য ভালো। কোন খাদ্যই ক্ষতিকর নয়। তবে এই সময়ে তাঁর খাদ্যের চাহিদা বেশী। তাই বাড়ীতে যাই রান্না হোক না কেন, গর্ভবতী মা আগের তুলনায় বেশী খাবেন। সম্ভব হলে আমিষ জাতীয় খাবার যেমন ডাল, মাছ ইত্যাদি বেশী খাবেন। শাক-সব্জি প্রত্যেক বাড়ীতেই রান্না হয় এবং তা নিয়মিত গর্ভবতী মা'কে খাওয়াতে হবে। এই সময় পানির প্রয়োজনও বেশী হয়। তাই প্রচুর পানি খেতে হবে। অনেক গর্ভবতী মহিলাদের পা ফুলে যায়, তাই তাঁদের খাদ্যে লবণের পরিমাণ কমিয়ে আনা ভাল। আলাদা করে লবণ খাওয়া বর্জন করতে হবে।

ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা

গর্ভাবস্থায় মহিলারা যাতে কোন রোগে আক্রান্ত (Infection) না হন সে জন্য প্রত্যেক গর্ভবতী মা'কে ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। প্রত্যহ গোসল করতে হবে। দাত ও নখ এবং কাপড়-চোপড় পরিস্কার রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, গর্ভাবস্থা কোন রোগ নয়। তাই সংসারের সব কাজকর্ম আগের মতই করা যাবে, তবে ভারী কাজ বা অত্যধিক পরিশ্রম না করাই ভাল।

দুপুরে খাবার পর একটু বিশ্রাম নিলে শরীর সতেজ থাকে। এ সময় অনেকের কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। তাই প্রচুর পরিমাণ পানি এবং নিয়মিত শাক-সব্জি খেলে শরীর ভাল থাকে। নবজাত শিশু যাতে স্বাভাবিকভাবে বুকের দুধ খায় সে জন্য গর্ভকালীন সময় থেকেই স্তনের যত্ন নিতে হবে। যেমন ঃ গোসলের সময় নিয়মিত স্তনের বোটা পরিস্কার করতে হবে। যদি বোটা স্তনের ভিতরে ঢোকানো থাকে তাহলে তেল দিয়ে বোটা আস্তে আস্তে টেনে দিতে হবে। জন্মের পরপরই শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য গর্ভবতী মহিলাকে উৎসাহিত করতে হবে।

টিটেনাস বা ধনুষ্টংকারের ইনজেকশন

এই টিকা প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলার জন্য আবশ্যক। গর্ভধারণের ৪ থেকে ৭ মাসের মধ্যে দু'টি ইনজেকশন ১ মাস অন্তর অন্তর নিতে হবে। এই টিকা নিলে মা ও শিশু ধনুষ্টংকারের হাত থেকে রেহাই পাবেন। যদি গর্ভবতী মহিলা ৫ বৎসরের মধ্যে এই ইনজেকশন দিয়ে থাকেন, তাহলে বর্তমান গর্ভাবস্থায় একবার টিকা নিলেই চলবে।

নিরাপদ প্রসব

গর্ভকালীন সময়ের শেষের দিকে প্রত্যেক গর্ভবতী মায়ের উচিত নিরাপদ প্রসবের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা। পরিস্কার কাপড়, সাবান, নতুন ব্লেড, সুতা ইত্যাদি জোগাড় করে রাখতে হবে। প্রসবের খানিকক্ষণ পূর্বে ব্লেড ও সুতা সিদ্ধ করে জীবাণু মুক্ত করতে হবে। আগে থেকেই প্রসবের জন্য একটি জায়গা পরিস্কার করে রাখা উচিত।

গর্ভকালীন সময় গর্ভবতী মায়ের শারিরীক যত্ন এবং মানসিক প্রশান্তি প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বাড়ীর সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা করা উচিত। তাহলে মা ও নবজাত শিশু উভয়েরই ভবিষ্যত সুন্দর হয়ে উঠবে। ■

ইউনিসেফ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ ঘোষণা

১. জন্মের পরপরই শিশুকে মায়ের প্রথম শাল দুধ খাওয়ান।

২. গর্ভবতী ও প্রসূতি মাকে তার পুষ্টি এবং শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য বেশী করে খাবার খেতে হবে।

৩. পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধই যথেষ্ট।

৪. শিশুর বয়স পাঁচ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য খাবার খাওয়ান।

৫. যে কোন অসুখে শিশুকে মায়ের দুধ ও অন্যান্য খাবার বার বার খেতে দিন।

জেনে রাখা ভাল

কৃত্রিম পদ্ধতিতে শ্বাস-প্রশ্বাস

একজন মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে ৬-৭ মিনিটের মধ্যে মারা যেতে পারে। মাত্র চার মিনিট অক্সিজেন না পেলে মানুষের মস্তিস্কে স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যায়। সুতরাং ফুসফুসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাতাস প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কোন ব্যক্তি বা শিশুর শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে তার বুকের ওঠা নামা বন্ধ হয়ে যায়, তার ঠোঁট, গলা, কানের লতি নীল রং ধারণ করে, এমনকি মুখমণ্ডলের রংও নীলাভ হয়ে যায়। যদি শ্বাসক্রিয়া বন্ধ থাকে তবে স্বাভাবিকভাবেই হৃদপিণ্ডের কার্যকলাপও বন্ধ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে গলার নাড়ী পরীক্ষা করলে কোন স্পন্দন অনুভূত হবে না। মনে রাখতে হবে, হৃদপিণ্ডের কার্যকলাপ চলছে কিনা তা বুঝার জন্য গলার নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষা করাই একমাত্র সঠিক উপায়।

শ্বাসনালীর যে কোন জায়গায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলেই শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। জিহবা মুখগহবরের পিছন দিকে নেমে যায়। এর ফলে বমি অথবা থুথু জমা হয়ে শ্বাসনালীতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

সুতরাং, প্রথম পদক্ষেপ হবে শ্বাসনালী পরিস্কার করা। এজন্য রোগীকে এমনভাবে শুইয়ে দিতে হবে যাতে তার মাথা পিছন দিকে পড়ে এবং চিবুক বা থুতনী উচু হয়। এজন্য এক হাত রোগীর ঘাড়ের নিচে রেখে রোগীর মাথা উচু করে ধরতে হবে এবং আর এক হাত দিয়ে এমনভাবে কপালে চাপ দিতে হবে যাতে চিবুক উচু হয়। এবার পরিস্কার আংগুল দিয়ে প্রতিবন্ধকটি সরিয়ে দিতে হবে। ফলে, আপনা-আপনি পুনরায় শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু হয়ে যেতে পারে।

মুখে মুখ রেখে

যদি শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরায় শুরু না হয়, তবে যে হাত কপালের উপর আছে সেই হাতের বৃদ্ধাংগুল ও তর্জনী দিয়ে রোগীর নাক চেপে ধরতে হবে। তারপর, বড় শ্বাস নিয়ে রোগীর খোলা মুখে নিজের মুখ চেপে ধরে ফুসফুসের সমস্ত বায়ু ফু দিয়ে রোগীর ফুসফুসে প্রবেশ করাতে হবে।

রোগীর বুক সম্প্রসারিত হলে ফু দেয়া বন্ধ রেখে লক্ষ্য করতে হবে রোগীর ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে কিনা। এই পদ্ধতিতে প্রতি মিনিটে ১২ বার রোগীর মুখে ফু দিয়ে তার ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করাতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না রোগীর নিজের শ্বাসক্রিয়া চালু হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। শিশুর ক্ষেত্রে কৃত্রিম পদ্ধতিতে শ্বাস দেয়ার সময় তার নাক ও মুখ একসাথে নিজের মুখ দিয়ে চেপে ধরা সম্ভব (কারণ জায়গাটি অত্যন্ত ছোট)। অপেক্ষাকৃত হালকাভাবে এবার ঘন ঘন ফু দিতে হবে (প্রতি মিনিটে ২০-৩০ বার)।

বুকের উপর চাপ দিয়ে

রোগীর হৃদপিণ্ডের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেলে মস্তিস্কে রক্ত সরবরাহও হবে না। এই অবস্থায় শুধু মুখে মুখ রেখে কৃত্রিম পদ্ধতিতে ফু দিলে শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরায় চালু হবে না, তাই সাথে সাথে বুকের উপর চাপ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।

রোগীর বুকের হাড়ের নিম্নাংশে এক হাতের তালুর নিচের অংশ রেখে আংগুলগুলো অবশ্যই উচু করে রাখতে হবে যাতে আংগুলের চাপ বুকের উপর না পড়ে। এখন আর এক হাতের তালু প্রথম হাতের উপর রেখে দু'হাত দিয়ে বুকের উপর চাপ দিতে হবে।

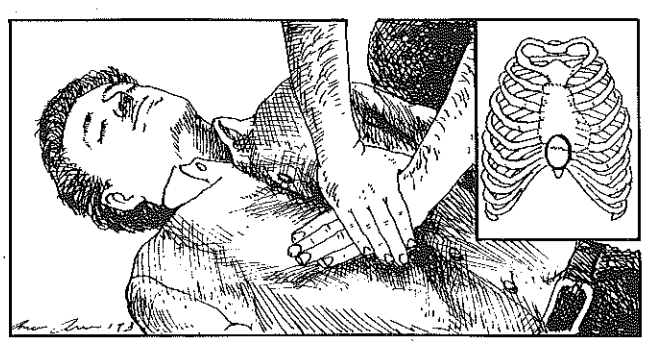

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমনভাবে চাপ দিতে হবে যাতে তার বুক অন্ততঃ ৪০ মিলিমিটার (১ ½ ইঞ্চি) ডেবে যায়। এই ভাবে প্রতি মিনিটে ৮০ বার চাপ দিতে হবে। যদি সংগে কোন সাহায্যকারী থাকে তবে ৫ বার বুকে চাপ দেয়ার সাথে ১ বার ফু দিয়ে কৃত্রিম শ্বাস দিতে হবে। যদি একাই এই প্রক্রিয়াটি (Resuscitation) করতে হয় তবে ১৫ বার বুকে চাপ দেয়ার পরপরই ২ বার মুখে ফু দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। তবে সব সময় গলার নাড়ীর দিকে খেয়াল রাখতে হবে। গলার নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া গেলে বুকে চাপ দেয়া বন্ধ করে শুধু ফু দিয়ে কৃত্রিম শ্বাস দিতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে দু'হাতের বদলে এক হাত ব্যবহার করতে হবে এবং অপেক্ষাকৃত কম চাপ দিতে হবে, তবে এক মিনিটে ৮০ থেকে ১০০ বার চাপ দিতে হবে (শিশুর বয়স অনুযায়ী)। খুব ছোট শিশুর ক্ষেত্রে দু'আংগুল দিয়ে প্রতি মিনিটে ১০০ বার ২৫ মিলিমিটার অথবা আধা ইঞ্চির কম চাপ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে প্রথম চার বার কৃত্রিম শ্বাস দেয়ার পর গলার নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রতি তিন মিনিট পরপরই তা পরীক্ষা করতে হবে। স্পন্দন পাওয়া গেলে বুঝতে হবে হৃদপিণ্ড আবার কাজ করতে শুরু করেছে। ■

স্বাস্থ্য কুইজ–৪

(উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ জুন ১৯৯৩)

১. শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ দিলে, তাকে পানি পান করানোর প্রয়োজন আছে কি? কেন?

২. ডায়রিয়া মহামারী আকারে দেখা দিলে একজন মাঠকর্মী কি করবেন?

৩. নিম্ন শ্বাসনালীর তীব্র প্রদাহের জন্য শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি (Respiratory Rate) কত হলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে প্রেরণ করা উচিত?

৪. শিশুদের স্বাভাবিক জন্ম-ওজন কত কেজি? একটি শিশুর জন্ম-ওজন কত হলে তাকে স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনের শিশু বলা হয়?

৫. বাংলাদেশে মোট কয়টি সরকারী মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র আছে?

নিয়মাবলী ঃ

১. সাদা কাগজে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে পাঠাবেন।

২. আই.সি.ডি.ডি.আর,বি-এর কোন কর্মচারী বা তাঁদের পরিবারের সদস্যবর্গ এ প্রতিযোগিতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৩. এ পত্রিকার বিচারকমন্ডলীর রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

৪. সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতাকে পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে ধরা হবে।

৫. তিন জন সঠিক উত্তরদাতাকে পুরস্কৃত করা হবে। সঠিক উত্তরদাতার সংখ্যা তিন জনের বেশী হলে লটারীর ভিত্তিতে তিন জনকে বাছাই করা হবে।

৬. প্রতি জন বিজয়ীর পুরস্কারের মান ১০০ টাকার প্রাইজবন্ড।

৭. খামের ওপর "স্বাস্থ্য কুইজ-৪" কথাটি লিখবেন। উত্তর পাঠাবার ঠিকানা ঃ সম্পাদক, স্বাস্থ্য সংলাপ, ডায়রিয়াল ডিজিজেস ইনফরমেশন সার্ভিসেস সেন্টার, আই.সি.ডি.ডি.আর,বি, জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০।

স্বাস্থ্য কুইজ–৩–এর উত্তর

উত্তর ১ ঃ-

রোগীর খিঁচুনী শুরু হলে, রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে, রোগীর প্রস্রাব ২৪ ঘন্টারও বেশী বন্ধ থাকলে, রোগীর পেট অস্বাভাবিক রকম ফুলে গেলে, খাওয়ার স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা শুরু করার ৭২ ঘন্টার পরও যদি ডায়রিয়া অনবরত চলতে থাকে, শ্বাস কষ্ট হলে, প্রবল জ্বর হলে, বেশী বমি হলে।

উত্তর ২ ঃ-

এক সাথে একই এলাকার অনেকে একই ধরনের ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হলে এবং আক্রান্ত হওয়ার অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু হলে এই অবস্থাকে ডায়রিয়া মহামারী বলে।

যদি আপনার এলাকায় ৩ বছরের বেশী বয়সের কোন ছেলে বা মেয়ে অথবা একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক ডায়রিয়া শুরু হওয়ার ১২ থেকে ৩৬ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে ডায়রিয়া মহামারী আকারে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করবেন।

উত্তর ৩ ঃ-

আল কোরাআন, সুরা বাকারা। ২৩৩ নং আয়াত।

উত্তর ৪ ঃ-

১লা আগষ্ট ১৯৯২।

উত্তর ৫ ঃ-

দেহের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের প্রতিদিন প্রায় ১৫০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন দরকার।

- এক বছরের মধ্যে

(উল্লেখ্য যে আমরা কারো কাছ থেকে সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাইনি)

আই.সি.ডি.ডি.আর,বি-এর বৈজ্ঞানিক সম্মেলন

আন্তর্জাতিক উদারময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আই.সি.ডি.ডি. আর,বি) আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী দ্বিতীয় বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ১৯৯৩ সালের ১৬ জানুয়ারী হতে ১৮ জানুয়ারী পর্যন্ত উক্ত কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ। কেন্দ্রের সাসাকাওয়া মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য সচিব সৈয়দ আহমদ, বাংলাদেশস্থ আমেরিকান রাষ্ট্রদূত উইলিয়ম বি. মাইলাম, বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)-এর প্রতিনিধি ডঃ রলফ সি. ক্যারিয়ার,

আই.সি.ডি.ডি.আর,বি-এর পরিচালক অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে ও এই সম্মেলনের সাংগঠনিক সম্পাদক ডঃ জিয়া উদ্দিন আহমেদ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আই.সি.ডি.ডি.আর,বি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য ও সমন্বিত অংশ। কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতি বছর ১ লক্ষ ডায়রিয়া রোগীর চিকিৎসা ও ২৫ হাজার রোগী ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পায়। তিনি বলেন, বিগত ১২ বছরে আই.সি.ডি.ডি.আর, বি-এর উদ্যোগে দেশের অন্ততঃ ১০ হাজার স্বাস্থ্য সেবী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া এই কেন্দ্রের মাধ্যমে বহু নিবেদিত বিজ্ঞানী আত্মপ্রকাশ করেছেন। এরা সবাই সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের জন্য অবদান রাখতে পারেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সম্মেলনে ডায়রিয়া রোগ, জনসংখ্যা সমস্যা এবং শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে তিনটি সিম্পোজিয়াম, বিশেষ বক্তৃতামালা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৬টি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ ও পোষ্টারে কেন্দ্রের সাম্প্রতিক গবেষণার প্রতিফলন ঘটে। এ ছাড়া সম্মেলনে আই.সি.ডি.ডি.আর,বি-এর বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা, ভবিষ্যৎ গবেষণার দিক নির্দেশনা প্রদান, ডায়রিয়া রোগ, জনসংখ্যা সমস্যা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ের উপর গবেষণা করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সম্মেলনে এন্টিবায়োটিক্সের অপব্যবহারের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ এবং হাম, নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ার প্রতিষেধক সংক্রান্ত গবেষণা নিয়েও আলোচনা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, দাতা সংস্থা, জাতীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিসহ প্রায় ১৫০ জন দেশী-বিদেশী ডাক্তার ও বিজ্ঞানী এই সম্মেলনে অংশ নেন। ■

নূতন ধরনের ডায়রিয়া

ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি জেলায় নূতন ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ডায়রিয়া রোগের বিস্তার ঘটছে। জীবাণুর নাম, 'ভিবরিও কলেরি নন- ও ওয়ান (*V. cholerae* non-01)। বিশেষজ্ঞগণের অভিমত, এই নূতন ধরনের জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট ডায়রিয়া কলেরার মতই তীব্র, কিন্তু কলেরা নয়। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আই.সি.ডি.ডি.আর,বি)-এর হাসপাতালে ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার ডায়রিয়া রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। তাদের অধিকাংশই এই নূতন ধরনের ডায়রিয়ার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত। এ পর্যন্ত এই হাসপাতালে এই রোগে কোন রোগী মারা যায়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে এই নূতন ধরনের ডায়রিয়া যতই তীব্র হোক না কেন সময়মত সঠিক চিকিৎসা হলে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। যে কোন ডায়রিয়া রোগের চিকিৎসার নিয়ম মোটামুটি একই রকম। আর তা হচ্ছেঃ পাতলা পায়খানা, বমি শুরু হলেই রোগীকে প্রথমে

বাড়ীতেই খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, পাতলা পায়খানা, বমি হলে শরীর হতে প্রচুর পানি বের হয়ে যায়। এই অবস্থাকে বলে 'ডিহাইড্রেশন' বা শরীরের পানিশূন্যতা। খাবার স্যালাইন খাওয়ালে এই পানিশূন্যতা দূর হবার কথা। অনেকে ২/১ বার রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়ানোর পর বন্ধ করে দেন। কিন্তু নিয়ম হচ্ছেঃ প্রতিবার পাতলা পায়খানার পরেই প্রাপ্তবয়স্ক রোগীকে আধা সের খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। পাতলা পায়খানা ও বমির তীব্রতা না কমলে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীকে নিকটস্থ হাসপাতাল অথবা চিকিৎসা কেন্দ্রে নেয়া উচিত অথবা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী রোগীকে চিকিৎসা দেয়া যেতে পারে। আই.সি.ডি.ডি.আর,বি হাসপাতালে আশংকাজনক এসব রোগীকে অন্তঃশিরা কলেরা স্যালাইন ও টেট্রাসাইক্লিন দ্বারা সফল চিকিৎসা করা হচ্ছে।

আর একটি কথা বলা দরকার, এই বছরে ডায়রিয়া আতংক জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। অনেকে বলছেন, আবার কলেরা শুরু হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছেঃ নূতন ধরনের ডায়রিয়ার জীবাণু ('ভিবরিও কলেরি নন-ও ওয়ান') ইতিপূর্বে এদেশে আর কখনও এত ব্যাপক ডায়রিয়া রোগের সৃষ্টি করেনি। মাইক্রো জীবাণুবিদগণ এই ব্যাকটেরিয়াকে নিষ্ক্রীয় অনুজীব হিসেবে জানতেন অর্থাৎ এরা রোগ ছড়ায় না। অথচ হঠাৎ করে এই নিষ্ক্রীয় জীবাণু কি করে সক্রীয় হয়ে উঠলো তা বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, পানির অতিরিক্ত লবণাক্ততা ও পরিবেশগত কারণে এরা সক্রীয় হয়ে উঠছে। তবে আন্দাজ বা অনুমান করে কিছু বলার উপায় নেই। এ ব্যাপারে আরও গবেষণা হওয়া উচিত। সনাক্ত হওয়া দরকার, জীবাণুটি ভিবরিও কলেরি নন-ও ওয়ানভূক্ত পরিবারের নূতন কোন জীবাণু কিনা। ■

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে, **সম্পাদক ঃ** ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা ; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ** এম. শামসুল ইসলাম খান; **কনসালটেন্ট এডিটর ঃ** ডাঃ এম. নজরুল ইসলাম; **সদস্য ঃ** ইউসুফ হাসান, ডাঃ আ. শ. মোঃ মিজানুর রহমান, মুজিবুর রহমান ও ডাঃ সেলিনা আমিন ; **সার্কুলেশন ম্যানেজার ঃ** হাসান শরীফ আহমেদ; **ডিজাইন ঃ** আসেম আনসারী। **প্রকাশক ঃ** আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আই.সি.ডি.ডি.আর,বি) জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০।
ফোন ঃ ৬০০১৭১-৮ ও ৬০০২৭১-২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬, টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আই.সি.ডি.ডি. বি.জে.।

মুদ্রণে ঃ আমাদের বাঙলা প্রেস লিঃ, ঢাকা।

আই.সি.ডি.ডি.আর,বি-এর পরিচালক অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে ও এই সম্মেলনের সাংগঠনিক সম্পাদক ডঃ জিয়া উদ্দিন আহমেদ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আই.সি.ডি.ডি.আর,বি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য ও সমন্বিত অংশ। কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতি বছর ১ লক্ষ ডায়রিয়া রোগীর চিকিৎসা ও ২৫ হাজার রোগী ডায়রিয়াজনিত মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পায়। তিনি বলেন, বিগত ১২ বছরে আই.সি.ডি.ডি.আর, বি-এর উদ্যোগে দেশের অন্ততঃ ১০ হাজার স্বাস্থ্য সেবী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া এই কেন্দ্রের মাধ্যমে বহু নিবেদিত বিজ্ঞানী আত্মপ্রকাশ করেছেন। এরা সবাই সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের জন্য অবদান রাখতে পারেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সম্মেলনে ডায়রিয়া রোগ, জনসংখ্যা সমস্যা এবং শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে তিনটি সিম্পোজিয়াম, বিশেষ বক্তৃতামালা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৬টি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ ও পোষ্টারে কেন্দ্রের সাম্প্রতিক গবেষণার প্রতিফলন ঘটে। এ ছাড়া সম্মেলনে আই.সি.ডি.ডি.আর,বি-এর বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা, ভবিষ্যৎ গবেষণার দিক নির্দেশনা প্রদান, ডায়রিয়া রোগ, জনসংখ্যা সমস্যা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ের উপর গবেষণা করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সম্মেলনে এন্টিবায়োটিক্সের অপব্যবহারের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ এবং হাম, নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়ার প্রতিষেধক সংক্রান্ত গবেষণা নিয়েও আলোচনা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, দাতা সংস্থা, জাতীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিসহ প্রায় ১৫০ জন দেশী-বিদেশী ডাক্তার ও বিজ্ঞানী এই সম্মেলনে অংশ নেন। ■

নূতন ধরনের ডায়রিয়া

ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি জেলায় নূতন ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ডায়রিয়া রোগের বিস্তার ঘটছে। জীবাণুর নাম, 'ভিবরিও কলেরি নন- ও ওয়ান (*V. cholerae* non-01)। বিশেষজ্ঞগণের অভিমত, এই নূতন ধরনের জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট ডায়রিয়া কলেরার মতই তীব্র, কিন্তু কলেরা নয়। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আই.সি.ডি.ডি.আর,বি)-এর হাসপাতালে ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার ডায়রিয়া রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। তাদের অধিকাংশই এই নূতন ধরনের ডায়রিয়ার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত। এ পর্যন্ত এই হাসপাতালে এই রোগে কোন রোগী মারা যায়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে এই নূতন ধরনের ডায়রিয়া যতই তীব্র হোক না কেন সময়মত সঠিক চিকিৎসা হলে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। যে কোন ডায়রিয়া রোগের চিকিৎসার নিয়ম মোটামুটি একই রকম। আর তা হচ্ছেঃ পাতলা পায়খানা, বমি শুরু হলেই রোগীকে প্রথমে

বাড়ীতেই খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, পাতলা পায়খানা, বমি হলে শরীর হতে প্রচুর পানি বের হয়ে যায়। এই অবস্থাকে বলে 'ডিহাইড্রেশন' বা শরীরের পানিশূন্যতা। খাবার স্যালাইন খাওয়ালে এই পানিশূন্যতা দূর হবার কথা। অনেকে ২/১ বার রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়ানোর পর বন্ধ করে দেন। কিন্তু নিয়ম হচ্ছেঃ প্রতিবার পাতলা পায়খানার পরেই প্রাপ্তবয়স্ক রোগীকে আধা সের খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। পাতলা পায়খানা ও বমির তীব্রতা না কমলে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীকে নিকটস্থ হাসপাতাল অথবা চিকিৎসা কেন্দ্রে নেয়া উচিত অথবা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী রোগীকে চিকিৎসা দেয়া যেতে পারে। আই.সি.ডি.ডি.আর,বি হাসপাতালে আশংকাজনক এসব রোগীকে অন্তঃশিরা কলেরা স্যালাইন ও টেট্রাসাইক্লিন দ্বারা সফল চিকিৎসা করা হচ্ছে।

আর একটি কথা বলা দরকার, এই বছরে ডায়রিয়া আতংক জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। অনেকে বলছেন, আবার কলেরা শুরু হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছেঃ নূতন ধরনের ডায়রিয়ার জীবাণু ('ভিবরিও কলেরি নন-ও ওয়ান') ইতিপূর্বে এদেশে আর কখনও এত ব্যাপক ডায়রিয়া রোগের সৃষ্টি করেনি। মাইক্রো জীবাণুবিদগণ এই ব্যাকটেরিয়াকে নিষ্ক্রীয় অনুজীব হিসেবে জানতেন অর্থাৎ এরা রোগ ছড়ায় না। অথচ হঠাৎ করে এই নিষ্ক্রীয় জীবাণু কি করে সক্রীয় হয়ে উঠলো তা বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, পানির অতিরিক্ত লবণাক্ততা ও পরিবেশগত কারণে এরা সক্রীয় হয়ে উঠছে। তবে আন্দাজ বা অনুমান করে কিছু বলার উপায় নেই। এ ব্যাপারে আরও গবেষণা হওয়া উচিত। সনাক্ত হওয়া দরকার, জীবাণুটি ভিবরিও কলেরি নন-ও ওয়ানভূক্ত পরিবারের নূতন কোন জীবাণু কিনা। ■

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে, **সম্পাদক ঃ** ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা ; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ** এম. শামসুল ইসলাম খান; **কনসালটেন্ট এডিটর ঃ** ডাঃ এম. নজরুল ইসলাম; **সদস্য ঃ** ইউসুফ হাসান, ডাঃ আ. শ. মোঃ মিজানুর রহমান, মুজিবুর রহমান ও ডাঃ সেলিনা আমিন ; **সার্কুলেশন ম্যানেজার ঃ** হাসান শরীফ আহমেদ; **ডিজাইন ঃ** আসেম আনসারী। **প্রকাশক ঃ** আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আই.সি.ডি.ডি.আর,বি) জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০।
ফোন ঃ ৬০০১৭১-৮ ও ৬০০২৭১-২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬, টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আই.সি.ডি.ডি. বি.জে.।

মুদ্রণে ঃ আমাদের বাঙলা প্রেস লিঃ, ঢাকা।